প্রোফেসর শঙ্কু

শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান

সত্যজিৎ রায়

2021

প্রিয় শঙ্কু,

আমার দলের একটি লোকের কালাজ্বর হয়েছে তাই তাকে নাইরোবি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তার হাতেই চিঠি যাচ্ছে, সে ডাকে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করবে। এই চিঠি কেন লিখছি সেটা পড়েই বুঝতে পারবে। খবরটা তোমাকে না দিয়ে পারলাম না। সবাই কথাটা বিশ্বাস করবে: না; বিজ্ঞানীরা তো নয়ই। তোমার মনটা খোলা, নানা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তোমার হয়েছে, তাই তোমাকেই বলছি।

মোকেলে-মবেম্বে কথাটা তোমার চেনা কি? বোধ হয় না, কারণ আমি কঙ্গে এসেই কথাটা প্রথম শুনছি। স্থানীয় লোকেরা বলে মোকেলে-মবেম্বে নাকি একরকম অতিকায় জানোয়ার। বর্ণনা শুনে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের কথাই মনে হয়। কঙ্গোর অরণ্যে নাকি এ জানোয়ারকে দেখা গেছে। কথাটা প্রথমে যখন শুনি তখন স্বভাবতই আমার কৌতূহল উদ্রেক করে। কিন্তু মাসখানেক থাকার পরও যখন সে প্রাণীর দেখা পেলাম না, তখন সে নিয়ে আর চিন্তা করিনি। তিনদিন আগে একটি অতিকায় প্রাণীর পায়ের ছাপ আমি দেখেছি লিপু নদীর ধারে। এ পা আমাদের কোনও চেনা জানোয়ারের নয়। ছাপের আয়তন দেখে প্রাণীটিকে বিশাল বলেই মনে হয়-অন্তত হাতির সমান তো বটেই। তবে আসল জানোয়ারের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আশা আছে, কিছুদিনের মধ্যেই পাব। সম্ভব হলে তোমায় জানাব।

আমি এখন রয়েছি ভিরুঙ্গা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে কঙ্গোর অরণ্যের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। আমার বিশ্বাস এখানে এর আগে সভ্য জগতের কোনও প্রাণীর পা পড়েনি। তোমার অভাব তীব্রভাবে বোধ করছি। পারলে একবার এ অঞ্চলটায় এসো। এই আদিম অরণ্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের কবি ট্যাগোর হয়তো পারতেন। গীতাঞ্জলি এখনও আমার চিরসঙ্গী।

সেই ইটালিয়ান দলের কোনও হদিস পাইনি এ পর্যন্ত। স্থানীয় লোকে বলছে, সে দল নাকি মোকেলে-মবেম্বের শিকারে পরিণত হয়েছে।

আশা করি ভাল আছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ক্রিস ম্যাকফারসন

ভূতাত্ত্বিক ও খনিবিশারদ ক্রিস্টোফার ম্যাকফারসনের সঙ্গে আমার আলাপ হয় ইংল্যান্ডে বছরতিনেক আগে। আমি তখন আমার বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের অতিথি হয়ে সাসেক্সে বিশ্রাম করছি। টেলিফোনে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করে ম্যাকফারসন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তার হাতে ছিল এক কপি ইংরাজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ। ভিতরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই সই। ম্যাকফারসনের বাবা ছিলেন ইস্কুল মাস্টার। তিনি নিজে কবিকে দিয়ে এই বইয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। ট্যাগোরের প্রতি বাপের ভক্তি এখন ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আমি তাকে আরও তিনখানা রবীন্দ্রনাথের বই কিনে দিই।

তারপর দেশে ফিরেও ম্যাকফারসনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি পেয়েছি। সে যে কঙ্গো যাচ্ছে সে খবরও সে দিয়েছিল। এখন ভয় হচ্ছে, গত বছর প্রোফেসর সানতিনির নেতৃত্বে যে ইটালিয়ান দলটি কঙ্গোর জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে যায়, ম্যাকফারসনের দলেরও হয়তো সেই দশাই হয়েছে। কারণ চার মাস আগে এই চিঠি পাবার পর আজ অবধি ম্যাকফারসনের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। যে আন্তজাতিক ভৌগোলিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ম্যাকফারসনের দল কঙ্গে গিয়েছিল, তারাও কোনও খবর পায়নি। অথচ রেডিয়ো মারফত এদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

এই নিয়ে পর পর তিনটি দল উধাও হল। কঙ্গোর জঙ্গলে। দু বছর আগে একটি জার্মান দলেরও এই দশা হয়। এদের কয়েকজনকে আমি চিনি। দলপতি প্রোফেসর কার্ল হাইমেনডর্ফের সঙ্গে আমার আলাপ হয় বছরসাতেক আগে। বহুমুখী প্রতিভা এই বিজ্ঞানীর। একাধারে ভূতাত্ত্বিক, পদার্থবিদ, ভাষাবিদ ও দুঃসাহসী পর্যটক। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও দৈহিক শক্তি প্রচণ্ড। একবার এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে এক সতীর্থের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় হাইমেনডর্ফ এক ঘুষিতে তাঁর চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলেন।

এই দলে ছিলেন আরও তিনজন। তার মধ্যে ইলেকট্রনিকসে দিকপাল প্রোফেসর এরলিখা ও ইনভেন্টর পদার্থবিদ রুডলফ গাউস আমার পরিচিত। চতুর্থ ব্যক্তি এনজিনিয়র গটফ্রীড হাল্‌সমানকে আমি দেখিনি কখনও।

এই দলটিও নিখোঁজ হয়ে যায় চার মাসের মধ্যেই।

ম্যাকফারসনের চিঠিটা পাবার পর থেকেই কঙ্গোর আদিম অরণ্য আমার মনকে বিশেষভাবে টানছে। কী রহস্য লুকিয়ে আছে। ওই অরণ্যে কে জানে! মোকেলে-মবেম্বের ব্যাপারটাই বা কতটা সত্যি? প্রায় দেড়শো কোটি বছর ধরে জীবজগতে রাজত্ব করার পর আজ থেকে ৭০ কোটি বছর আগে ডাইনোসর শ্রেণীর জানোয়ার হঠাৎ পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যায়। এই ঘটনার কোনও কারণ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাননি। উদ্ভিদভোজী ও মাংসাশী, দুই রকম জানোয়ারই ছিল এদের মধ্যে। পৃথিবীর কোনও অজ্ঞাত অংশে কি তারা এখনও বেঁচে আছে? যদি কঙ্গোর অরণ্যে থেকে থাকে, তা হলে তাদের উদ্দেশে ধাওয়া করাটা কি খুব অন্যায় হবে?

দিন পনেরো আগে কঙ্গে যাবার প্রস্তাব দিয়ে আমার দুই বন্ধু সন্ডার্স ও ক্রোলকে চিঠি লিখি। উদ্দেশ্য ম্যাকফারসনের দলের খোঁজ করা। সন্ডার্স জানায় যে, আন্তজাতিক ভৌগোলিক সংস্থার কতা লর্ড কানিংহ্যামের সঙ্গে তার যথেষ্ট আলাপ আছে। কঙ্গো অভিযান সম্পর্কে সন্ডার্স সবিশেষ আগ্রহী; শুধু খরচটা যদি সংস্থা জোগায়, তা হলে আর কোনও ঊদ• থংদ্র নষী।

ক্রোলের যে উৎসাহ হবে, সেটা আগে থেকেই জানতাম। যেমন জীবজন্তু, তেমনই খনিজ সম্পদে কঙ্গোর তুলনা মেলা ভার। একদিকে হাতি সিংহ হিপো লেপার্ড গেরিলা শিম্পাঞ্জি; অন্যদিকে সোনা হিরে ইউরেনিয়াম রেডিয়াম কোবাল্ট প্ল্যাটিনাম তামা।

কিন্তু ক্রোলের লক্ষ্য সেদিকে নয়। সে বেশ কয়েক বছর থেকেই ঝুকেছে। অতিপ্রাকৃতের দিকে। তা ছাড়া নানান দেশের মন্ত্রতন্ত্র ভেলকি ভোজবাজির সঙ্গে সে পরিচিত। এ সবের সন্ধানে সে আমার সঙ্গে তিব্বত পর্যন্ত গিয়েছে। নিজে গত বছরে হিপ্নোটিজম অভ্যাস

করে সে ব্যাপারে রীতিমতো পারদর্শী হয়ে উঠেছে। আফ্রিকাতে এসব জিনিসের অভাব নেই, কাজেই ক্রোলের আগ্রহ স্বাভাবিক।

অর্থাৎ আমরা তিনজনেই কোমর বেঁধে তৈরি আছি। এখন ভৌগোলিক সংস্থার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা। এই সংস্থাই ম্যাকফারসনের দলের খরচ জুগিয়েছিল। আমাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হবে, সেই দলের অনুসন্ধান করা। সুতরাং সে কাজে সংস্থার খরচ না দেবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই।

২১শে এপ্রিল

সুখবর। আজ টেলিগ্রাম পেয়েছি। ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ফাউন্ডেশন আমাদের অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করতে রাজি। সন্ডার্স কাজের কাজ করেছে। আমরা ঠিক করেছি, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ব।

২৯শে এপ্রিল

আমাদের দলে আরেকজন যোগ দিচ্ছে। একজন নয়, দুজন। ডেভিড মানরো ও তার গ্রেট ডেন কুকুর রকেট।

যার নামে মানরো দ্বীপ, যেখানে আমাদের লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের কথা আমি আগেই বলেছি, সেই হেকটর মানরোর বংশধর তরুণ ডেভিড মানরো তার কুকুর সমেত আমাদের অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। কবিভাবাপন্ন এই যুবকটি অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাগল। পড়াশুনা আছে বিস্তর, এবং বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, যথেষ্ট সাহস ও দৈহিক শক্তি রাখে। সে। সন্ডার্সের কাছে খবরটা পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ অভিযানে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আফ্রিকার জঙ্গল-বিশেষ করে কঙ্গোর ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট সম্বন্ধে সে নাকি প্রচুর পড়াশুনা করেছে। তাকে সঙ্গে না নিলে নাকি তার জীবনই বৃথা হবে। এ ক্ষেত্রে না করার কোনও কারণ দেখিনি।

আমরা সকলে নাইরোবিতে জমায়েত হচ্ছি। সেখানেই স্থির হবে কীভাবে কোথায় যাওয়া।

৭ই মে

আজ সকালে আমরা নাইরোবিতে এসে পৌঁছেছি।

আমাদের হোটেলটা যেখানে, তার চারিপাশে আদিম আফ্রিকার কোনও চিহ্ন নেই। ছিমছাম সমৃদ্ধ আধুনিক শহর, ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট দোকানপাট সব কিছুতেই পশ্চিমি আধুনিকতার ছাপ। অথচ জানি যে, পাঁচ মাইলের মধ্যেই রয়েছে খোলা প্রান্তর-যাকে এখানে বলে সাভানা-যেখানে অবাধে চরে বেড়াচ্ছে নানান জাতের জন্তু জানোয়ার। এই সাভানার দক্ষিণে রয়েছে তুষারাবৃত মাউন্ট কিলিমানজারো।

এখানে জিম ম্যাহোনির পরিচয় দেওয়া দরকার। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের আয়ারল্যান্ডের এই সন্তানটির রোদো-পোড়া গায়ের রং আর পাকানো চেহারা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ হচ্ছে যাকে বলে একজন হোয়াইট হান্টার। শিকার হল এর পেশা। আফ্রিকার জঙ্গলে অভিযান চালাতে গেলে একজন হোয়াইট হান্টার ছাড়া চলে না। স্থানীয় ভাষাগুলি এদের সড়গড়, অরণ্যের মেজাজ ও জলহাওয়া সম্বন্ধে এঁরা ওয়াকিবহাল, আর হিংস্র জন্তু জানোয়ার থেকে আত্মরক্ষার উপায় এঁদের জানা। ম্যাহোনিই আমাদের জিনিসপত্র বইবার জন্য কিকুউয়ু উপজাতীয় ছজন কুলির ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

হোটেলের কফি-শিপে বসে আমাদের কথাবাত হচ্ছিল। তিন-তিনটে অভিযাত্রীদল পর পর উধাও হয়ে গেল, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ম্যাহোনি তার পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কঙ্গোর জঙ্গলে যে কত রকম বিপদ লুকিয়ে আছে, তার ফিরিস্তি আর কী দেব তোমাদের। জঙ্গলের গা ঘেঁষে পুব দিকে রয়েছে পর পর সব আগ্নেয়গিরি। মুকেন্ধুি, মুকুবু, কানাগোরাউই। রোয়ান্ড ছাড়িয়ে কিভু হ্রদ পেরোলেই এই সব আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে জঙ্গল শুরু। বড় রকম অগ্নুৎপাতের কথা সম্প্রতি শোনা যায়নি বটে, কিন্তু হঠাৎ কখন এগুলো জেগে উঠবে, তা কে বলতে পারে? তা ছাড়া ওই সব অঞ্চলে নরখাদক ক্যানিবলসের অভাব নেই। তার উপর অরণ্যের স্বাভাবিক বিপদগুলোর কথাও তো

ভাবতে হবে। শুধু হিংস্র। জানোয়ার নয়, মারাত্মক ব্যারামও হতে পারে কঙ্গোর জঙ্গলে। কথা হচ্ছে, তোমরা কোথায় যেতে চাও তার ওপর কিছুটা নির্ভর করছে।

উত্তরটা সন্ডার্স দিল।

আমরা যে হারানো দলটার খোঁজ করতে যাচ্ছি, তাদের একজন মাস চারেক আগে কালাজ্বর হয়ে এখানে হাসপাতালে চলে আসে। সে অবিশ্যি কিছুদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে ফিরে যায়; কিন্তু আমরা হাসপাতাল থেকে খবর নিয়েছি যে, দলটাি মুকেকু আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে যাচ্ছিল।

তোমরাও সেই দিকেই যেতে চাও?

সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

বেশ। তবে সেখানে পৌঁছতে হলে তোমাদের পায়ে হাঁটতে হবে প্রায় দেড়শো মাইল, কারণ হেলিকপ্টার শেষ অবধি যাবে না। ল্যান্ডিং-এর জন্য খোলা সমতল জায়গা পাবে না।

ভৌগোলিক সংস্থা আমাদের জন্য দুটো বড় হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একটাতে আমরা যাব, আরেকটায় কুলি আর মাল।

মানরো কিছুক্ষণ থেকেই উশখুশ করছিল, এবারে তার প্রশ্নটা করে ফেলল।

মোকেলে-মবেম্বের কথা জান তুমি?

ম্যাহোনি আমাদের চমকে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠল।

এ সব গল্প কোথায় শোন?

আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, সম্প্রতি একাধিক পত্রিকায় কঙ্গো সম্বন্ধে প্রবন্ধে আমি এই অতিকায় জানোয়ারের কথা পড়েছি।

ও সব আষাঢ়ে গল্পে কান দিয়ে না,। বলল ম্যাহোনি। এদের কিংবদন্তিগুলির বয়স যে কী হাজার বছর, তার কোনও হিসেব নেই। আমি আজ সাতাশ বছর ধরে আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরছি, চেনা জানোয়ারের বাইরে একটি জানোয়ারও কখনও দেখিনি।

মানরো বলল, কিন্তু আমি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি পাদরিদের লেখা বিবরণ নিজে পড়েছি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। তারা আফ্রিকার জঙ্গলে অতিকায় জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখেছে। হাতির পায়ের মতো বড়, কিন্তু হাতি না। .

সেরকম আরও জানোয়ারের কথা শুনবে, বলল ম্যাহোনি। কাকুন্ডাকারির নাম শুনেছ? হিমালয়ে যেমন ইয়েতি বা তুষারমানব, আফ্রিকার জঙ্গলে তেমনই কাকুন্ডাকারি। দুপায়ে হাঁটা লোমশ জানোয়ার, গেরিলার চেয়েও বেশি লম্বা। এও সাতাশ বছর ধরে শুনে আসছি, কিন্তু কেউ চোখে দেখেছে বলে শুনিনি। তবে হ্যাঁ-যেটা এই সব অঞ্চলে আছে, কিন্তু কোথায় আছে তা জানা যায়নি, তেমন একটা জিনিস আমার কাছেই আছে।

ম্যাহোনি তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি জিনিস বার করে সামনের টেবিলে কফির পেয়ালার পাশে রাখল। মুঠো ভরে যায় এমন সাইজের একটি স্বচ্ছ পাথর।

নীল শিরাগুলি লক্ষ করো। বলল ম্যাহোনি।

এটা কি ব্লুডায়মন্ড? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ, বলল ম্যাহোনি, প্রায় সাতশো ক্যারেট। এটাও এই কঙ্গোর জঙ্গলেই পাওয়া যায়। সম্ভবত যেদিকে আমরা যাব, মোটামুটি সেই দিকেই। এক পিগমি পরিবারের সঙ্গে বসে ভোজ করছিলাম। তাদেরই একজন এটা আমাকে দেখায়। দু প্যাকেট সিগারেটের বদলে সে এটা আমাকে দিয়ে দেয়।

এর তো আকাশ ছোঁয়া দাম হওয়া উচিত। পাথরটা হাতে নিয়ে সসম্ভ্রমে বলল ডেভিড মানরো।

আমি বললাম, ঠিক তা নয়। রত্ন হিসেবে ব্লুডায়মন্ডের দাম বেশি নয়। তবে কোথায় যেন পড়েছি, ইলেকট্রনিকসের ব্যাপারে। এর চাহিদা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে।

আমরা সকলে পালা করে হীরকখণ্ডটা দেখে আবার ম্যাহোনিকে ফেরত দিয়ে দিলাম।

৮ই মে, রাত সাড়ে দশটা

কঙ্গোর আদিম অরণ্যের ঠিক বাইরে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় ক্যাম্প ফেলেছি আমরা। আমারই আবিষ্কার শ্যাঙ্কলন প্লাস্টিকের তাঁবু, হালকা অথচ মজবুত। সবসুদ্ধ পাঁচটা তাঁবু। তার তিনটোতে আমরা পাঁচজন ভাগাভাগি করে রয়েছি; আমি আর ডেভিড একটায়, ক্রোল ও সন্ডার্স আরেকটায় আর তৃতীয়টায় জিম ম্যাহোনি। বাকি দুটোয় রয়েছে কুলির দল। মশারির ভিতরে বসে লিখছি। মশার উপদ্রব সব সময়ই। তবে আমার কাছে আমারই তৈরি সর্বরোগনাশক মিরাকিউরল বড়ি আছে, তাই ব্যারামের ভয় করি না। আসল জঙ্গলে কাল প্রবেশ করব। তার আগে আজকের ঘটনাগুলো লিখে রাখি।

সকাল আটটায় নাইরোবি থেকে হেলিকপ্টারে রওনা দিয়ে কেনিয়া ছেড়ে রোয়ান্ডায় এসে রাওয়ামাগোমা এয়ারফিলাডে নেমে আমাদের তেল নিতে হল। তারপর কিভু হ্রদ পেরিয়ে আধা ঘণ্টা চলার পর একটা খোলা জায়গায় নেমে আমরা উত্তরমুখী হাঁটতে শুরু করলাম। আকাশ থেকেই দেখেছিলাম, গভীর অরণ্য সবুজ পশমের গালিচার মতো ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের পশ্চিমে আর উত্তরে। যত দূর দৃষ্টি যায় সবুজের মধ্যে কোনও ফাঁক নেই। এই ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের বিস্তৃতি দু হাজার মাইল। তার অনেক অংশেই সভ্য মানুষের পা পড়েনি কখনও।

হেলিকপ্টার আমাদের নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গেল। নইরোবির সঙ্গে রেডিয়োর যোগাযোগ থাকবে আমাদের। অভিযানের শেষে আবার হেলিকপ্টার এসে আমাদের নিয়ে যাবে। এক মাসের মতো খাবারদাবার আছে আমাদের সঙ্গে।

যেখানে নোমলাম, সেখান থেকে উত্তরে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি, আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গগুলো গাছপালার উপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। এইসব পাহাড়ের গায়ে পার্বত্য গেরিলার বাস। আমরা রয়েছি উপত্যকায়। এর উচ্চতা হাজার ফুটের উপর। এ অঞ্চলে হাতি, হিপো, লেপার্ড, বানর শ্রেণীর নানান জানোয়ার, ওকাপি, প্যাঙ্গোলিন, কুমির ও অন্যান্য সরীসৃপ—সবই পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই অনেক অপরিসর নদী বয়ে গেছে, কিন্তু সেগুলো এতই খরস্রোতা যে, নদীপথে যাতায়াত খুবই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের তাই পায়ে হাঁটা ছাড়া গতি নেই।

সাড়ে দশটায় চা-বিস্কুট খেয়ে আমরা রওনা দিলাম। আমাদের যেতে হবে উত্তরে, খানিকটা পথ উঠতে হবে পাহাড়ের গা দিয়ে, তারপর নেমে প্রবেশ করব আসল গভীর জঙ্গলে। এখানে জঙ্গল তেমন গভীর নয়, উপরে চাইলে আকাশ দেখা যায়। গাছের মধ্যে মেহগনি, টিক আর আবলুশই প্রধান, মাঝে মধ্যে এক-আধটা বাঁশঝাড়, আর সর্বত্রই রয়েছে লতা জাতীয় গাছ। হিংস্র জানোয়ারের অতর্কিত আবিভাবের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। ম্যাহোনির হাতে একটা দোনলা বন্দুক, ক্রোল ও কুলিসদর কাহিন্দির হাতে একটা করে রাইফেল। কাহিন্দি লোকটি বেশ। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে, নিজের ভাষা সোয়াহিলি। আমিও যে সোয়াহিলি জানি, সেটা কাহিন্দির কাছে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। বেশ মজার এই সোয়াহিলি ভাষাটা। এরা বলে চায় তৈয়ারি- অর্থাৎ চা প্রস্তুত। আসলে যেমন বাংলায়, তেমনি সোয়াহিলিতে, বেশ কিছু আরবি, ফারসি, হিন্দি, পোর্তুগিজ কথা মিশে গেছে।

সিঙ্গল ফাইলে চলেছি আমরা সকলে, সবার আগে জিম ম্যাহোনি। আমাদের চারজনের মধ্যেই একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। যে ইটালিয়ান দলটি হারিয়ে গেছে, তাদের কাউকেই আমরা চিনতাম না, কিন্তু হাইমেনডার্ককে ক্রোল বেশ ভাল ভাবেই চিনত, আর

ক্রিস ম্যাকফারসনের সঙ্গে তো সন্ডার্সের অনেক দিনের পরিচয়। একমাত্র ডেভিড মানরো আমাদের ছাড়া কাউকেই চেনে না, কিন্তু তার উৎসাহ আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। লিভিংস্টোন যে পথে গেছে, স্ট্যানলি, মাঙ্গো পার্ক যে পথে গেছে, সে পথে সেও চলেছে– এটা ভাবতেই যে তার রোমাঞ্চ হচ্ছে, সে কথা সে একাধিকবার বলেছে। আমাদের। রকেটকে আগে যখন দেখেছি তখনও সে আশ্চর্য শিক্ষিত কুকুর ছিল। কিন্তু এবার যেন দেখছি আরও বেড়েছে তার বুদ্ধি আর আনুগত্য। জন্তু জানোয়ার যে এক-আধটা চোখে পড়ছে না তা নয়- গাছের ডালে বাঁদর তো প্রায়ই দেখা যাচ্ছে-কিন্তু সে সম্বন্ধে রকেট সম্পূর্ণ উদাসীন। দৃষ্টি যদি বা একবার সেদিকে যায়, হাটা থামানোর কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ঘণ্টাখানেক চলার পর হঠাৎ দেখলাম ম্যাহোনি হাঁটা বন্ধ করে তার ডান হাতটা উপরে তুলে আমাদেরও থামতে বলল। কুলি সমেত সকলেই থামল, কেবল কাহিন্দি এগিয়ে গিয়ে ম্যাহোনির পাশে দাঁড়াল।

আমাদের সামনে খানিকটা খোলা জায়গা, তারপর প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে ঝোপ আর গাছের পিছনে দেখতে পাচ্ছি, একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠছে। গাছের ফাঁক দিয়ে কয়েকটি প্রাণীর চলাফেরাও যেন দেখা যাচ্ছে। জানোয়ার নয়, মানুষ।

কিগানি কানিবলস, চাপা ফিসফিসে গলায় বলে ম্যাহোনি। টেক কাভার বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ।

ম্যাহোনি তার বন্দুকের সেফটি-ক্যাচটা নামিয়ে নিয়েছে, সেটা একটা খুট শব্দ থেকেই বুঝেছি। কাহিন্দির হাতের বন্দুকও তৈরি। ক্রোল কী করছে সেটা আর পিছন ফিরে দেখলাম না। আমরা চারজনে এবং ছজন কুলি, ছড়িয়ে পড়ে এক-একটা গাছের গুড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বনে বিবির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

প্রায় দশ মিনিট এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমে অদৃশ্য হল। এবারে কিছু ঘটবে কি?

হ্যাঁ, ঘটল। ঝোপ আর গাছের পিছন থেকে একদল কৃষ্ণাঙ্গ বেরিয়ে এল। তাদের হাতে তির ধনুক, গায়ে সাদা রঙের ডোরা, চোখের কোটির আর ঠোঁট বাদ দিয়ে সারা মুখ জুড়ে ধবধবে সাদা রঙের প্রলেপ। দেখলে মনে হয়, ধড়ের উপর একটা মড়ার খুলি বসানো। নরখাদক। কথাটা ভাবতেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শিহরন খেলে গেল। আড়চোখে ডাইনে চেয়ে দেখলাম, ডেভিড থরথর করে কাঁপছে, তার বিস্ফারিত দৃষ্টি দলটার দিকে নিবদ্ধ। বেশ বুঝলাম কাঁপুনি আতঙ্কের নয়, উত্তেজনার।

নরখাদকের দল এগিয়ে এসেছে আমাদের দিকে। লক্ষ করলাম ম্যাহোনির বন্দুক এখনও নামানো রয়েছে। কাহিন্দিরও।

লোকগুলো এই দুজনকে দেখল, এবং দেখে থামল।

তারপর তাদের দৃষ্টি ঘুরল। এদিক ওদিক। আমাদেরও দেখেছে। এ গাছের গুড়ি তেমন প্রশস্ত নয় যে, আমাদের সম্পূর্ণ আড়াল করবে।

সমস্ত বনটা যেন শ্বাসরোধ করে রয়েছে। আমি নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

প্রায় এক মিনিট এইভাবে থাকার পর নরখাদকের দল মৃদুমন্দ গতিতে আমাদের পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুখ খুলল প্রথমে ডেভিড মনরো।

বাট দে ডিড়নট ইট আস।

ম্যাহোনি হেসে উঠল। খাবে কেন? তোমার যদি পেট ভরা থাকে, তা হলে তোমার সামনে এক প্লেট মাংস এনে রাখলে খাবে কি?

ওরা খেয়ে এল বুঝি?

আমার তো তাই বিশ্বাস।

মানুষের মাংস?

সেটা আর একটু এগিয়ে গেলেই বুঝতে পারব।

আমরা আবার রওনা দিলাম। ঝোপঝাড় গাছপালা পেরোতেই আরেকটা খোলা জায়গায় পৌঁছোলাম। বাঁয়ে একটা পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। ম্যাহোনি বলল, সেটা চাষির কুটির। এ অঞ্চলে চাষ হয়, সেটা আসার সময় ভুট্টার ক্ষেত দেখে জেনেছি। কুটিরে জনমানব নেই সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

ওই দ্যাখো, অঙ্গুলি নির্দেশ করল ম্যাহোনি।

ডাইনে কিছু দূরে একটা নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে রক্তমাখা হাড়। সেগুলো যে মানুষের সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কিগানিদের বাসস্থান আমরা পিছনে ফেলে এসেছি বলল ম্যাহোনি। এরা আহার সংগ্রহ করতেই বেরিয়েছিল।

কিন্তু এই ধরনের অসভ্যতা এখনও রয়েছে আফ্রিকায়? প্রশ্ন করল সন্ডার্স।

ম্যাহোনি বলল, সরকার এদের অভ্যোস পরিবর্তন করানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়নি। অবিশ্যি আমি নিজে এদের অসভ্য বলতে রাজি নই। এইটেই বলা যায় যে, এদের খাদ্যের রুচিটা সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু অন্য রকম। ক্যানিবলিজম বহু জানোয়ারের মধ্যে দেখা যায়। আর মানুষের মাংস শুনেছি অতি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। এরা রংটং মেখে ওইরকম চেহারা করে বেড়ায়, তাই; আসলে এদের সম্বন্ধে যে পৈশাচিক কথাটা ব্যবহার করা হয়, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এরা হাসতে জানে, ফুর্তি করতে জানে, পরোপকার করতে জানে।

সন্ধ্যা নাগাদ আমরা একটা ক্যাম্পের উপযোগী জায়গায় পৌঁছোলাম। পরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কাল আমরা মুকেকু আগ্নেয়গিরির পাদদেশ দিয়ে এগিয়ে যাব আসল অরণ্যের দিকে।

৯ই মে, রাত নটা

আজকের দিনটা ক্যাম্পেই কাটাতে হল, কারণ সারাদিন বৃষ্টি। বিকেলের দিকে একবার বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল, তখন ক্যাম্পের কাছে একদল বান্টুর আগমন হয়। এই বিশেষ উপজাতিটি সারা কঙ্গোর অরণ্যে ছড়িয়ে আছে। এদের সঙ্গে একটি ওঝা বা উইচ ডক্টর ছিল। ম্যাহোনির সাহায্যে ক্রোল তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবাত বলে। আফ্রিকার উইচ ডক্টররা অনেক সময় ভবিষ্যদবাণী করে। ওঝামশাই আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন যে, আমাদের নাকি চরম বিপদের মধ্যে পড়তে হবে। লাল মানুষকে যেন আমরা বিশ্বাস না। করি। এই বিপদ থেকে নাকি আমরা মুক্তি পাব একটি নতুন-ওঠা চাঁদের রঙের গোলকের সাহায্যে। আমাদের মঙ্গলের জন্য ওঝা পাঁচটি হাতির ল্যাজের চুল রেখে গেছে। সেগুলো আমাদের কবজিতে পেচিয়ে পরতে হবে।

ক্রোল সারা সন্ধে ওঝার কথার মানে বার করার চেষ্টায় কাটিয়েছে।

১০ই মে, রাত দশটা

আজ মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ক্রিস ম্যাকফারসন যে আর ইহজগতে নেই, তার প্রমাণ আজ পেয়েছি। আজকের দিনটা ঘটনাবহুল ও বিভীষিকাময়, তাই সব গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করতে হবে। কী অদ্ভুত এক রাজ্যে যে এসে পড়েছি, সেটা এখনও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না। আমাদের কিকুইয়ু কুলিদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করছি। ভয় হয়, তারা বুঝি আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাবে। কাহিন্দি তাদের অনেক করে বুঝিয়েছে। তাতে ফল হলেই রক্ষে।

আজ দিনটা ভাল ছিল, তাই ভোর থাকতে রওনা হয়ে আটটার মধ্যে আমরা মুকেকুর পাদদেশে পৌঁছে গেলাম। এখানকার মাটিতে ভলক্যানিক অ্যাশ অতীতের অগ্ন্যুৎপাতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অনেকবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে। এ সব আগ্নেয়গিরিতে, সেটা বেশ বোঝা যায়।

পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় সাড়ে ছ হাজার ফুট উঠে তিনটে নাগাদ আমরা টিনের মাংস, মাছ, চিজ, রুটি ও কফি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারলাম।

আমাদের নীচেই পশ্চিমে বিছানো রয়েছে। কঙ্গোর আদিম অরণ্য। ঘন সবুজের এমন সমারোহ এর আগে কখনও দেখিনি। এই উচ্চতায় গরম নেই, কিন্তু জানি, যত নীচে নামিব ততই গরম বাড়বে, আর তার সঙ্গে একটা ভ্যাপসা ভাব। মেঘ করে আছে, পথে অল্পস্বল্প বৃষ্টিও পেয়েছি। কয়েক বার।

হাজার খানেক ফুট নীচে নামার পর আমরা প্রথম গেরিলার সাক্ষাৎ পেলাম। আমাদের পথ থেকে দশ-পাঁচিশ গজ ডাইনে গাছপালা-লতাগুলেক্স ঘেরা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে খানদশেক ছোট-বড় গেরিলা। স্বাভাবিক পরিবেশে গেরিলা দেখার অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে, তবু অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও না থেমে পারলাম না।

ক্রোলের হাতে বন্দুক আপনিই উঠতে শুরু করেছে দেখে ম্যাহোনি তাকে চাপা গলায় ধমক দিল–

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? একটা বন্দুক দিয়ে তুমি অতগুলো গেরিলাকে মারবে? নামাও ওটা।

ক্রোলের হাত নেমে এল।

গেরিলাগুলো আমাদের দেখেছে। তাদের মধ্যে একটি-বোধ হয় পালের গোদা–দল ছেড়ে আমাদের দিকে খানিকদূর এগিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে বুকের উপর অত্যন্ত দ্রুত চাপড় মেরে দামামার মতো শব্দ করল। এর মানে আর কিছুই না–এটা

আমাদের এলাকা, তোমরা এ দিকে এসো না। গেরিলা যে অযথা মানুষকে আক্রমণ করে না, সেটা আমাদের সকলেরই জানা।

কিন্তু আমরা জানলে কী হবে, কুকুর তো জানে না! রকেটের রোখ চেপে গেছে। সে এক হুংকার ছেড়ে এক লাফে এগিয়ে গেছে গেরিলার দিকে। ডেভিডের হাতে চেন, কিন্তু কুকুরের দাপানিতে সে প্রায় ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পরে আর কী! আর সেই মুহুর্তে ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ভয়ংকর ব্যাপার।

গেরিলাটা হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে কর্কশ হুংকার ছেড়ে ধেয়ে এল আমাদের দিকে।

সংকটের মুহুর্তে চিরকালই আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কাজ করে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। আমাদের দলের তিনটি বন্দুকের একটিও উঁচিয়ে ওঠবার আগেই আমি বিদ্যুদ্বেগে আমার কোটের পকেট থেকে অ্যানাইহিলিনটা বার করে গেরিলার দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিয়েছি। পরমুহূর্তেই গেরিলা উধাও।

ম্যাহোনি বা কাহিন্দি কেউই আমার এই ব্রহ্মাস্ত্রের কথাটা জানত না; কাজেই তারা যে একেবারে হকচকিয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্যকী?

হোয়া-হোয়াট ডিড ইউ ডু? হতভম্বর মতো জিজ্ঞেস করে উঠল ম্যাহোনি।

জবাবটা দিল ক্রোল। ওটা প্রোফেসর শঙ্কুর অনেক আশ্চর্য আবিষ্কারের একটা। আত্মরক্ষার জন্য সামান্য একটি অস্ত্র।

কাহিন্দির মুখও হাঁ হয়ে গেছে। ম্যাহোনি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ছে। আমি বললাম, অন্য গেরিলারা আর কোনও উৎপাত করবে বলে মনে হয় না। চলো, আমরা এগোই।

ম্যাহোনি আর কথা না বলে তার দু হাত দিয়ে আমার হাতটা ধরে গভীর সম্ভ্রামের সঙ্গে ঝাঁকিয়ে দিল। আমরা আবার এগোতে শুরু করলাম।

বলাবাহুল্য, ওঠার চেয়ে নামার পর্বটা আরও দ্রুত হল। আমরা যখন উপত্যকায় পৌঁছে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছি, তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে।

কঙ্গোর এই আদিম অরণ্য যে এক আশ্চর্য নতুন জগৎ, সেটা এসেই বুঝতে পারছি। এ পরিবেশ ভোলবোর নয়। এক একটা গাছের বেড় পঞ্চাশ-ষাট ফুট, মাথায় একশো-দেড়শো ফুট। উপরে চাইলে আকাশ দেখা যায় না। মনে আপনা থেকেই একটা ভক্তিভাব আসে, যেমন আসে মধ্যযুগীয় কোনও গির্জায় ঢুকলে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এখানে লতাপাতার প্রাচুর্য হলেও, আগাছা প্রায় নেই বললেই চলে। জমি পরিষ্কার, কাজেই হাঁটার কোনও অসুবিধা নেই। ম্যাহোনি বলল, আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য বলে যখন কিছু নেই, তখন যে কোনও একটা দিক ধরে গেলেই হল। তবে হারানো দলের চিহ্নের জন্য দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে।

জমি ঠিক সমতল নয়, একদিকে সামান্য ঢালু। কারণ এখনও আমরা চলেছি আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে। এই অন্ধকারেও রঙের অভাব নেই; নানা রকম প্রজাপতি চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, ফুলও অপর্যাপ্ত, আর মাঝে মাঝে কর্কশ ডাক ছেড়ে এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্ছে কাকাতুয়া শ্রেণীর বিচিত্র সব পাখি।

এর মধ্যে রকেট হঠাৎ আবার সরব হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ডেভিডের হাতে টান পড়েছে। কুকুর একটা বিশেষ দিকে যাবার জন্য উৎসুক।

আমরা থামলাম। ডেভিডের স্টপ ইট, রকেট-এ কোনও ফল হল না। কুকুর তাকে টেনে নিয়ে গেল। লিয়ানা লতায় ঘেরা বিশাল এক গুঁড়ির পিছনে।

আমরাও তার পিছনে গিয়ে কুকুরের উত্তেজনার কারণটা বুঝলাম।

একটি অচেনা মানুষের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে গাছের ছড়ানো শিকড়ের উপরে। গায়ের মাংসের অনেকখানি খেয়ে গেছে কোনও জানোয়ার, তবে জানোয়ারই তার মৃত্যুর কারণ

কি না, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। এটা যে স্থানীয় কোনও উপজাতির লাশ নয়, সেটা পায়ের জুতো আর বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি দেখেই বোঝা যায়।

হাতির কীর্তি বলল ম্যাহোনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, লাশের পাঁজরার হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে আছে।

কাহিন্দি দেখি মাথা নাড়ছে।

নো টেন্তু, বোয়ানা। নো টেন্ধু, নো কিবোকো।

অর্থাৎ হাতিও না, হিপোও না।

তবে কী বলতে চাও তুমি? বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞেস করল ম্যাহোনি।

মোকেলে-মবেম্বে, বোয়ানা! বায়া সানা, বায়া সানা।

বায়া সানা-অর্থাৎ ভেরি ব্যাড।

ম্যাহোনি তো রেগে টং।–আবোল তাবোল বকবে তো ঘাড় ধরে বের করে দেব তোমাকে।

কিন্তু আমি তো জানি! আমি তো শুনেছি তার গর্জন।

এ সব কী বলছি কাহিন্দি? কী বলতে চাও খুলে বলো তো? কী শুনেছ। তুমি?

আমি তো বোয়ানা সান্তিনির দলেও কুলির সদর ছিলাম।

এ খবরটা অ্যাদ্দিন চেপে রেখেছে। কাহিন্দি। সে নিরুদ্দিষ্ট ইটালিয়ান দলটার সঙ্গেও ছিল।

কাহিন্দি এবার খুলে বলল ব্যাপারটা। মুকেঙ্কুর পাদদেশে একটা খোলা জায়গায় রাত্তিরে ক্যাম্প ফেলে সান্তিনির দল। আমরা যেখানে আছি, তার আরও কিছুটা উত্তরে। মাঝরাত্তিরে একটা গর্জন শুনে কাহিন্দির ঘুম ভেঙে যায়। সে তাঁবু ছেড়ে বাইরে এসেই

কিছু দূরে মাটি থেকে প্রায় আট-দশ হাত উপরে অন্ধকারে এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ দেখতে পায়। তারপর কাহিন্দি আর সেখানে থাকেনি। মাইলখানেক দৌড়ে তারপর হেঁটে ফিরে আসে সভ্য জগতে। তার অভিজ্ঞতার কথা সে অনেককে বলেছে, কিন্তু সাহেবরা কেউ বিশ্বাস করেনি। কাহিন্দির নিজের ধারণা, ইটালিয়ান দলের সকলেই এই দানবের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।

তা হলে তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কেন? প্রশ্ন করল ম্যাহোনি। নাকি আমাদের দল থেকে পালাবার মতলব করছিলে?

কাহিন্দি মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, এসেছি রুটির জন্য, বোয়ানা। আবার সে দানবকে দেখলে আবার পালাতাম—তবে এখন বোয়ানা শঙ্কুর অস্ত্র দেখে ভরসা পেয়েছি। আর পালাব না।

তা হলে তোমার কুলিদেরও সে কথা বলে দেবে। যারা একবার এসেছে, তারা আর দল ছেড়ে যেতে পারবে না, এই তোমায় বলে দিলাম।

চাঞ্চল্যকর ঘটনার শেষ এখানেই নয়। শ্বেতাঙ্গের লাশ আবিষ্কার আর কাহিন্দির স্বীকারোক্তির পর আবার রওনা দিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে এক পিগমির দলের সামনে আমাদের পড়তে হল।

চার ফুট থেকে সাড়ে চার ফুট লম্বা এই পিগমিরা যে এত নিঃশব্দে চলাফেরা করে, সেটা আমার ধারণা ছিল না। দলটার সামনে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব টের পাইনি। আর সামনে পড়া মাত্র তারা আমাদের ঘিরে ফেলল। ম্যাহোনি গলা তুলে বলল, ভয় নেই, এরা নিরীহ। তবে এদের কৌতূহলের শেষ নেই।

প্রত্যেকের হাতে তিরধনুক, আর তুণের সঙ্গে বাঁধা একটি করে চামড়ার থলি। তিরের ডগায় যে খয়েরি রং-সেটা যে বিষ, তা আমি জানি। বইয়ে পড়েছি, এরা কেবল ক্ষুধা

নিবৃত্তির জন্য শিকার করে, এদের মধ্যে হিংস্রভাব এতটুকু নেই। এদের দেখেও সেটাই মনে হয়।

ম্যাহোনি এগিয়ে গিয়ে এদের সঙ্গে বান্টু ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। কয়েকজন এগিয়ে এসেছে রকেটের দিকে। আফ্রিকায় দুর্ধর্ষ শিকারি, বুনো কুকুরের অভাব নেই, কিন্তু এ জাতের কুকুর এরা কেউ কখনও দেখেনি।

ম্যাহোনির কথা তখনও চলেছে, এমন সময় দেখলাম। পিগমিরা তাদের থলি থেকে নানারকম জিনিসপত্র বার করতে শুরু করেছে।

আশ্চর্য! এ যে সবই আমাদের সভ্য জগতের জিনিস! বাইনোকুলার, কম্পাস, ক্যামেরা, ঘড়ি, ফাউনটেন পেন, জুতো, ফ্লাস্ক–এ সব এরা পেল কোথায়?

কথা শেষ করে ম্যাহোনি আমাদের দিকে ফিরে বলল, বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ এরা গত কয়েক মাসের মধ্যে এ অঞ্চলে দেখেছে। এ সব জিনিস কোত্থেকে পাওয়া, বুঝতেই পারছ।

তিনটি দলই যে প্রাণে মারা পড়েছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে আরেকটি পিগমি তার থলি থেকে আর একটি জিনিস বার করেছে, যেটা দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল।

একটা বই-এবং সেটা আমার খুবই চেনা।

আমি এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়াতে বিনা বাক্যব্যয়ে পিগমিটি সেটা আমার হাতে তুলে দিল।

আমি ম্যাহোনিকে বললাম, জিজ্ঞেস করো তো এ বইটা আমি নিতে পারি কি না?

পিগমি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। আমি আমার পকেটে ভরে নিলাম ইংরেজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ। ঘটনাটা এতই বিস্ময়কর যে, কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। ম্যাকফারসনও যে মৃত, সেটার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

অতিকায় জানোয়ার সম্বন্ধে এরা কোনও খবর দিতে পারে কি?

ম্যাহোনি বলল, না। সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি আমি। তবে এরা বলছে, আকাশে একটা অদ্ভুত জিনিস উড়তে দেখেছে।

পাখি? সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

না, পাখি না। কোনও যান্ত্রিক যানও নয়, কারণ ওড়ার কোনও শব্দ ছিল না।

পিগমিরা চলে গেল। আমরা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আবার এগোতে শুরু করলাম।

সন্ধ্যা সাতটায় আমরা ক্যাম্প ফেললাম। কাছেই একটা খরস্রোতা নদীর শব্দ পাচ্ছি; কাল সেটা পেরোতে হবে আমাদের।

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। কী আছে আমাদের কপালে, কে জানে।

বাইরে বিদ্যুতের চমক আর মেঘের গর্জন। সেই সঙ্গে হাওয়াও দিচ্ছে। এই বোধ হয় বৃষ্টি শুরু হল।

১০ই মে, রাত পৌনে বারোটা

সাংঘাতিক ঘটনা। আমার হাতে কলম স্থির থাকছে না এখনও।

গতবার ডায়রি লিখে মশারি তুলে বিছানায় উঠব, এমন সময় বাইরে থেকে চিৎকার।

ডেভিড আর রকেট ঘুমোচ্ছিল, দুজনেই এক মুহূর্তে সজাগ। তিনজনে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলাম। তাঁবুর বাইরে। ক্রোল, সন্ডার্স, ম্যাহোনি, সকলেই তাঁবুর বাইরে হাজির।

আমাদের দৃষ্টি কুলিদের তাঁবুর দিকে, কারণ সেদিক থেকেই চিৎকারটা এসেছে। বাইরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। অন্যদিন তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বলে, আজ বৃষ্টিতে সে আগুন নিবে গেছে।

চিৎকার এখন আর্তনাদে পরিণত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি একটা দুম দুম শব্দ-যেন বিশাল একটা দুরমুশ পেটা হচ্ছে জমিতে।

সন্ডার্স আর আমি দুজনেই টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিলাম, শব্দ লক্ষ্য করে টর্চ ফেলতেই বর্ষণের বক্ররেখা ভেদ করে এক ভয়ংকর দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কুলিদের পর পর দুটো তাঁবু তছনছ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে-যেন তাদের উপর দিয়ে স্টিমরোলার চলে গেছে। তৃতীয় তাঁবুরও সেই অবস্থা হতে চলেছে, কারণ জ্বলন্ত চোখবিশিষ্ট একটি অতিকায় প্রাণী সেটার দিকে এগিয়ে আসছে দুই পা ফেলে।

প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর যুগের সবচেয়ে হিংস্র মাংসাশী জানোয়ার টির‍্যানোসরাস (SFS।

ইয়ের গান, শঙ্কু, ইয়ের গান-চিৎকার করে উঠল ক্রোল ও সন্ডার্স একসঙ্গে। ইতিমধ্যে ম্যাহোনি দুটো গুলি চালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি।

আমি কোট ছেড়ে ফেলেছিলাম, তাই অ্যানাইহিলিনের জন্য তাঁবুতে ফিরে যেতে হল। কয়েক সেকেন্ডের কাজ, কিন্তু তারই মধ্যে দেখলাম, ডেভিডের জাঁদরেল গ্রেট ডেন তাঁবুর ভিতর ফিরে এসে ল্যাজ গুটিয়ে থারথার করে কাঁপছে।

বাইরে বেরোতেই এক চোখ ধাঁধানো নীল আলো, আর তার সঙ্গে এক কর্ণভেদী বজ্রনিনাদ আমার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুটোকেই যেন সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দিল। আমার আর অ্যানাইহিলিনের ঘোড়া টেপা হল না।

তারপরেই আরেকটা বিদ্যুতের ঝলকে দেখলাম টির‍্যানোসরাস তার পথ পরিবর্তন করে আমাদের দিক থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

ইট্‌স বিন স্ট্রাক বাই লাইটনিং!—চেঁচিয়ে উঠল ম্যাহোনি।

কিন্তু তাতেও ওকে তেমন কাবু করতে পারেনি, আমি বললাম। কী সাংঘাতিক শক্তিশালী জানোয়ার!

বিধ্বস্ত তাঁবুগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম আমাদের তিনজন কুলি জানোয়ারের পায়ের চাপে পিষে গেছে। কাহিন্দি এবং অন্য তিনজন কুলি চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছিল, তাই তারা বেঁচে গেছে।

যে যার তাঁবুতে ফিরে এলাম। তবু ভাল যে, যত গর্জন, তত বর্ষণ হল না। এই বিভীষিকার পর প্রকৃতির অঝোর ক্রন্দন বরদাস্ত করা যেত না।

সকলকেই একটা করে আমার তৈরি সমনোলিন ঘুমের বড়ি দিয়ে দিয়েছি। রাত্রে ঘুম না। হলে কালকের ধকল সইবে না।

মোকেলে-মবেম্বে তা হলে মিথ্যে নয়!

১৩ই মে, নাইরোবি

কঙ্গোর এই অভিযান আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কোঠায় পড়ে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমন সব অপ্রত্যাশিত, শ্বাসরোধকারী ঘটনার সমাবেশ একমাত্র গল্পেই। পাওয়া যায়—তাও বেশি গল্পে নয়। সভ্যজগতে যে আর কোনওদিন ফিরতে পারব, তা ভাবিনি। সেটা যে সম্ভব হয়েছে, সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। অবিশ্যি সেই সঙ্গে আমাদের দলের প্রত্যেকের আশ্চর্য সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করতে হয়।

১০ই মে সকালে উঠেই যেটা দেখলাম, সেটা হল ভিজে মাটিতে টির্যানোসরাসের পায়ের

ছাপ।

ছাপ সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। এখন কথা হচ্ছে—আমরা যাব কোন দিকে?

কথাটা ম্যাহোনিকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, আমরা এমনিও উত্তরেই যাচ্ছিলাম, কাজেই এখন দিক পরিবর্তন করার কোনও মানে হয় না। পিছোতে তো আর পারি না; গেলে সামনেই যেতে হবে। আর জানোয়ারের কথা ভেবেও লাভ নেই। তার যদি আমাদের উপর আক্রোশ থাকে, তো সে আমাদের ধাওয়া করবেই—আমরা যেদিকেই যাই না কেন। আমার বিশ্বাস, তার গায়ে বাজ পড়ার ফলে সে খানিকটা কাবু হয়েছে; তার তাগাদ ফিরে পেতে কিছুটা সময় লাগবে।

ডেভিড মানরো সব শুনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলল, আমরা পায়ের ছাপাই অনুসরণ করব। বিংশ শতাব্দীতে দিনের আলোয় টির্যানোসরাসকে দেখতে পেলে, সারা জীবন আর কিছু না করলেও চলবে।

আমরা সাতটার মধ্যেই রওনা হয়ে পড়লাম। আমার মন বলছে, এখনও অনেক রহস্যের সমাধান হতে বাকি আছে। কুলি তিনজন কম, কাজেই কিছু হালকা মাল আমরা নিজেরাই ভাগাভাগি করে বইছি। কাহিন্দি যে এখনও রয়েছে সেটা শুধু ম্যাহোনির ধমকানির জন্য। তবে কতদিন থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আজ দিনটা পরিষ্কার, যদিও বনের দুর্ভেদ্য অন্ধকার তাতে বিশেষ কমছে না। আমরা পায়ের ছাপ ধরে এগোচ্ছি। অসমান দূরত্বে পড়েছে ছাপগুলো; দেখে মনে হয় জানোয়ারটা একটু খুঁড়িয়ে চলছিল।

মিনিট দশেক চলার পর যে নদীটির শব্দ পাচ্ছিলাম, সেটা সামনে এসে পড়ল। হাত পনেরোর বেশি চওড়া নয়। জলও হাঁটুর বেশি গভীর নয়, তাই হেঁটে পার হতে অসুবিধা হল না। জানোয়ারও নদী পেরিয়েছে, কারণ উলটো দিকে তার পায়ের ছাপ রয়েছে।

আরও সিকি মাইল গিয়ে দেখি, জমির জাত বদলে গেছে। এখানে আবার সেই ভলক্যানিক অ্যাশ আর পাথরের কুচি। আবার আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। এখানে বনের ঘনত্ব যেন কিছুটা কম, মাথার উপর পাতার অভেদ্য ছাউনিটা খানিকটা পাতলা হয়ে আকাশকে উঁকি দিতে দিচ্ছে।

এই জমিতে একটা জায়গার পরে পায়ের ছাপ ক্ষীণ হয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেছে। জানোয়ার কোনদিকে গেছে তা বোঝার আর উপায় নেই।

সোজা এগিয়ে চলো বলল ম্যাহোনি।

কিন্তু এগোনো আর হল না।

ভেলকির মতো গাছপালা ঝোপঝাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে একদল খাকি পোশাক পরিহিত কাফ্রি আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে তিরধনুক, এবং সেগুলো সবই আমাদের দিকে তাগ করা।

ম্যাহোনির হাতের বন্দুকটা মুহূর্তের মধ্যে উঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু চোখের পলকে তার বাঁ পাশ থেকে একটা তিরা এসে বন্দুকের নলটায় আঘাত করে সেটাকে ম্যাহোনির হাত থেকে ছিটকে মাটিতে ফেলে দিল।

তারপর তিরন্দাজ নিজেই এসে বন্দুকটা ম্যাহোনির হাতে তুলে দিয়ে, বান্টু ভাষায় তাকে কী যেন বলল। ম্যাহোনি আমাদের দিকে ফিরে বলল, এরা এদের সঙ্গে যেতে বলছে।

কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।

যেখানে নিয়ে যাবে।

এরা কারা?

এরা বান্টু, তবে পুরোপুরি অরণ্যবাসী নয়, সেটা দেখেই বুঝতে পারছি। বোঝাই যাচ্ছে এরা কারুর আদেশ পালন করছে। সে ব্যক্তিটি কে, সেটা এদের সঙ্গে না গেলে বোঝা যাবে না।

অগত্যা যেতেই হল। কমপক্ষে পঞ্চাশটি লোক যেখানে ধনুক উঁচিয়ে রয়েছে, সেখানে না যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

পাহাড়ের গা দিয়ে মিনিটপাঁচেক গিয়ে যেখানে পৌঁছোলাম, সেখানে প্রকৃতির উপর মানুষের হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। চারিদিকের গাছ কেটে ফেলে একটা খোলা জায়গা তৈরি করা হয়েছে, তার এক পাশে কাঠের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা সুদৃশ্য কাঠের ক্যাবিন। সেটাকে ফরেস্ট বাংলো বললে ভুল হবে না।

আমরা আমাদের গ্রেপ্তারকারীদের নির্দেশে এগিয়ে গেলাম ক্যাবিনের দিকে। মানুষ আছে কি ওই ক্যাবিনে?

হ্যাঁ, আছে।

আগে কণ্ঠস্বর, তারপর সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারী বেরিয়ে এলেন ক্যাবিনের বারান্দায়।

গুড মর্নিং, গুড মর্নিং!

লাল চুল আর মুখ ভর্তি লাল গোঁফদাড়ি দেখে চিনতে মোটেই কষ্ট হল না লোকটিকে।

ইনি জার্মানির বহুমুখী প্রতিভাধর বিজ্ঞানী প্রোফেসর কার্ল হাইমেনডর্ফ।

ওয়েলকম, প্রোফেসর শঙ্কু! ওয়েলকম, হের ক্রোল!

হাইমেনডর্ফ এবার হাতে তালি দিয়ে বান্টু দলটাকে ডিসমিস করে দিলেন।

আসুন সবাই ওপরে আসুন।

আমরা পাঁচজন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ভদ্রলোকের পিছন পিছন বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরে আরও দুজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক রয়েছেন, দুজনেই আমার চেনা-ডক্টর গাউস ও প্রোফেসর এরলিখ। পরিচয়পর্ব শেষ হবার পর হাইমেনডর্ফ বলল, আমাদের দলের আরেকজন, এঞ্জিনিয়ার হাল্‌সমান, একটু কাজে ব্যস্ত আছেন। তাঁর সঙ্গে পরে আলাপ হবে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, আমি খবর পেয়েছি, আপনারা এখানে এসেছেন। নইরোবির সঙ্গে রেডিয়ো কনট্যাক্ট আছে আমাদের। শুধু নাইরোবি কেন, পুবে নাইরোবি আর পশ্চিমে কিসাঙ্গানি, দুয়ের সঙ্গেই আছে। আবার কিসাঙ্গানি মারফত যোগ আছে দেশের সঙ্গে, কাজেই দুনিয়ায় কোথায় কী ঘটছে, সব খবরই আমরা পাই।

আমি বললাম, কিন্তু আপনারা যে বেঁচে আছেন, সে খবর তো বাইরের লোক জানে না।

হাইমেনডার্ক হো হো করে হেসে উঠল।

সে খবর তাদের জানতে দিলে, তারা নিশ্চয়ই জানবে। হয়তো আমরা জানতে দিতে চাই না।

কেন?

কাজের অসুবিধা হবে বলে।

আমি আর কিছু বললাম না। কাজ যে চলছে। এখানে, সে তো বুঝতেই পারছি, যদিও কী কাজ সেটা এখনও জানি না।

এবার সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে থাকলে আপনি ইটালিয়ান এবং ব্রিটিশ অভিযানের দলটি আসার কথাও শুনেছিলেন নিশ্চয়ই।

শুনেছিলাম। বইকী; কিন্তু তারপর তাদের কী হল সে খবর তো পাইনি।

কুলু বলল, তোমাদের এ অঞ্চলে যে একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বাস করে সে খবর রাখি কি?

হাইমেনডর্ফের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী?

টির‍্যানোসরাস রেক্স, টু বি এগজ্যাক্ট।

তোমরা তাকে দেখেছ?

শুধু দেখেছি না, প্রাণীটা আমাদের ক্যাম্পে হামলা করেছিল। তার পায়ের চাপে আমাদের তিনটি কুলি মারা গেছে।

কী আশ্চর্য বলল হাইমেনডর্ফ, কিন্তু কই, আমাদের এ তল্লাটে তো সে প্রাণী আসেনি।

একটি কৃষ্ণাঙ্গ বেয়ারা আমরা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কফি এনেছিল, সেটা খাওয়া শেষ হলে পর হাইমেনডর্ফ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের এইভাবে ধরে আনানোর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিশেষ দরকার ছিল। যখন খবর পেলাম তোমরা কাছাকাছির মধ্যে এসে গেছ, তখন সুযোগটা ছাড়তে পারলাম না। এবার চলো, তোমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাই। আমার মনে হয়, তোমাদের ইন্টারেস্টিং লাগবে।

হাইমেনডর্ফ, গাউস ও এরলিখ রওনা দিল; আমরা তাদের পিছনে সার বেঁধে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নোমলাম।

বাংলোর চারপাশটা গাছ আর ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হলেও, মাটিতে ভলক্যানিক অ্যাশ এখনও রয়েছে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভলক্যানো থেকে গলিত লাভার স্রোত বেরোয় সেটা ঠিকই, কিন্তু মানুষের পক্ষে আসল ভয়ের কারণ হয়। এই ছাই ও বিষাক্ত গ্যাস।

লাভার স্রোতের গতি খুবই মন্থর; মানুষ অনায়াসে দৌড়ে সেই স্রোতের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আমরা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। পুবে পাহাড়ের প্রাচীর উঠে গেছে উপর দিকে, তারই গায়ে এক জায়গায় দেখি একটা বিশাল কাঠের ভেজানো দরজা।

একটা স্বাভাবিক গুহাকে আমরা ব্যবহার করছি কাজের ঘর হিসেবে, বলল হাইমেনডার্ক। গুহাটা প্রায় চল্লিশ গজ গভীর। এ রকম আরও দুটো গুহা আছে, দুটোই আমাদের কাজে লাগে। প্রকৃতি আশ্চর্য ভাবে সাহায্য করেছে আমাদের কাজে।

কিন্তু প্রকৃতি যদি উৎপাত শুরু করেন? প্রশ্ন করল ক্রোল।

মানে?

এই সব আগ্নেয়গিরিতে যে বিস্ফোরণ হবে না, তার কী স্থিরতা?

তার উপক্রম দেখলে আমাদের দ্রুত পালাবার ব্যবস্থা আছে রহস্য করে বলল হাইমেনডার্ক।

আরও কিছু দূর গিয়ে একটা টানেলের মুখে পৌঁছোলাম আমরা। তিন জার্মান সমেত আমরা সেটায় প্রবেশ করলাম।

ভিতরে ঢুকেই আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হল, আর সেটা যে সত্যি, সেটা হাইমেনডর্ফের কথায় প্রমাণ হয়ে গেল।

এটা হল একটা কিম্বারলাইট পাইপ, বলল হাইমেনডর্ফ, দেওয়ালে যে পাথর দেখছ, তাতে হিরে লেগে আছে।

হিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানে একাধিক থিওরি আছে। একটা থিওরি বলে, ভূগর্ভে প্রায় হাজার মাইল নীচে প্রচণ্ড চাপ ও উত্তাপের ফলে কার্বন ক্রিস্ট্যালাইজড হয়ে হিরোয়

পরিণত হয়। সেই হিরে অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত খনিজ পদার্থের স্রোতের সঙ্গে উপরে উঠে আসে। সেই হিরেই লেগে থাকে পাথরের গায়ে এই সব সুড়ঙ্গের মধ্যে।

হাইমেনডর্ফ বলে চলল, একটা সাধারণ কিম্বারলাইট পাইপে ১০০ টন পাথর কেটে তার থেকে মাত্র ৩২ ক্যারাট হিরে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক আউন্সের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই সুড়ঙ্গে শাবলের এক আঘাতে ৫০০ ক্যারাট হিরে পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুড়ঙ্গে যে খনন কাজ চলছে, সেটা দেখেই বোঝা যায়। শাবল পড়ে আছে মাটিতে, সারা সুড়ঙ্গের গায়ে আলো বসানো রয়েছে, মাটিতে লাইনের উপর ট্রলি রয়েছে–মাল বাইরে বার করার জন্য।

এটা কি ব্লুডায়মন্ড? আমি প্রশ্ন করলাম।

তুমি তো খবরটাবর রাখা দেখছি, বাঁকা হাসি হেসে বলল হাইমেনডর্ফ। হ্যাঁ, এটা ব্লু ডায়মন্ড। একটা বিশেষ শ্রেণীর ব্লুডায়মন্ড-টাইপ টু-বি। রত্ন হিসেবে এর দাম কিছুই নয়। কিন্তু এই বিশেষ টাইপের হিরে ইলেকট্রনিকসে বিপ্লব এনে দিয়েছে। ব্লুডায়মন্ডের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই আমার বিশ্বাস। এই রকম পাইপ আরও আছে। এখানে, সেগুলোতেও কাজ চলছে। কাফ্রিদের বাগে আনতে পারলে কাজ ভালই করে। আমার খনিতে শ্রমিক এবং পুলিশ দুই-ই কৃষ্ণাঙ্গ।

আমরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলাম। দুপুর গড়িয়ে গেছে। যে পথে গিয়েছি, সেই পথেই আবার ফেরা শুরু করলাম। এবার সেই বন্ধ দরজাটার সামনে এসে হাইমেনডর্ফ সেটাকে খুলে দিয়ে আমাদের ভিতরে ঢুকতে বলল।

এ যেন আলিবাবার গুহা। ভিতরে আসবাবপত্র যন্ত্রপাতির এমন সমারোহ যে, একবার ঢুকলে সেটাকে আর গুহা বলে মনেই হয় না। গবেষণাগার, বিশ্রামকক্ষ, কনফারেন্স রুম-সব কিছুই বলা চলে এটাকে।

এত সব জিনিসপত্র দেখে অবাক হচ্ছে বোধ হয়, বলল হাইমেনডার্ক। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে সরবরাহের ব্যাপারটা আজকের যুগে কোনও সমস্যাই নয়।

চারজন অস্ত্রধারী দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে তারা পুলিশ।

ক্রোল ছাড়া আমরা সবাই সোফায় বসলাম। ক্রোলের একটা ছটফটে ভাব, সে ঘুরে ঘুরে দেখছে। একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা কি রিমোট কনট্রোলে কোনও কিছুকে চালনা করছি নাকি? এতে নানারকম নির্দেশ লেখা সুইচ দেখছি।

হাইমেনডার্ক শুকনো গলায় বলল, হাল্‌সমান একজন অতি দক্ষ এঞ্জিনিয়ার। আর ইনভেনটর হিসেবে প্রোফেসর শঙ্কুর সমকক্ষ না হলেও, গাউসের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। মানুষের পরিশ্রম লাঘব করা যখন ইলেকট্রনিকসের একটা প্রধান কাজ, তখন নানারকম বাইরের কাজ যাতে ঘরে বসেই করা যায়, তার চেষ্টা আমরা করি বইকী। তোমরা যে এদিকে আসছ, সেটা তো আমি গুহায় বসেই জেনেছি।

গুহার একদিকে পাশাপাশি চারটে টেলিভিশন স্ক্রিন দেখছিলাম; হাইমেনডর্ফ উঠে গিয়ে পর পর চারটে বোতাম টিপতেই জঙ্গলের চারটে অংশের ছবি তাতে দেখা গেল।

ভিডিও ক্যামেরা লাগানো আছে গাছের গায়ে, বনের চার জায়গায়, বলল হাইমেনডর্ফ।

ক্রোল অগত্যা সোফায় এসে বসল।

এবার হাইমেনডর্ফের চেহারায় একটা পরিবর্তন দেখা দিল। হালকা ভাবটা চলে গিয়ে তার জায়গায় এল এক থমথমে গাম্ভীর্য। সে উঠে দাঁড়িয়ে দু-একবার পায়চারি করে গলা খাঁকরে নিয়ে বলল, বুঝতেই পারছি, আমরা যে কাজটা এখানে করছি, তাতে গোপনীয়তা রক্ষণ করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা চার কর্মী, কিসাঙ্গানি আর নাইরোবিতে আমাদের নিজেদের লোক, আমার বেতনভোগী কফ্রি কর্মীরা, জার্মানিতে আমাদের এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষক, আর তোমরা কজন ছাড়া আর কেউ এই ব্লু ডায়মন্ড মাইনসের কথা জানে না। তোমরা জেনেছ, কারণ তোমরা কাছাকাছি এসে পড়েছিলে বলে

তোমাদের আমি বলতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু বুঝতেই পারছি যে, তোমাদের মারফত খবরটা বাইরে পাচার হয়, সেটা আমি কোনও মতেই ঘটতে দিতে পারি না।

হাইমেনডর্ফ কথা থামাল। গুহার মধ্যে চূড়ান্ত নৈঃশব্দ্য। ম্যাহোনি দাঁতে দাঁত চেপে কোনওমতে নিজেকে সামলে রেখেছে। বাকি তিনজন পাথরের মতো অনড়, তাদের দৃষ্টি হাইমেনডর্ফের দিকে। গাউস ও এরলিখকে দেখে তাদের মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। নিঃশব্দতা ভেঙে ক্রোলই হঠাৎ কথা বলে উঠল। হাইমেনডার্ককে উদ্দেশ করে।

কার্ল, হিটলারের আমলে তোমার কী ভূমিকা ছিল, সেটা এদের বলবে কি? বুখেনওয়ালাড কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ইহুদি বন্দিদের উপর এক তরুণ পদার্থবিদ কী ধরনের অত্যাচার–

উইলহেলাম!

হাইমেনডর্ফ গর্জিয়ে উঠেছে। ক্রোলের যা বলার, তা বলা হয়ে গেছে, তাই সে চুপ করল। আমি অবাক হয়ে দেখছি হাইমেনডর্ফের দিকে। চোখে ওই ক্রূর দৃষ্টি, ওই ইস্পাত শীতল কণ্ঠস্বর-একজন প্রাক্তন নাৎসির পক্ষে মানানসই বটে।

আর একটি শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি গুহায় এসে ঢুকলেন। ছং ফুটের উপর লম্বা, ঘন কালো ভুরু, এক মাথা অবিন্যস্ত কালো চুল, চোখে পুরু চশমা। ইনিই নিশ্চয়ই হাল্‌সমান। হাইমেনডর্ফের দিকে চেয়ে অল্প মাথা নেড়ে। ভদ্রলোক যেন বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কাজটা হয়ে গেছে।

সাঙ্গা! মোবুটু!

হাইমেনডর্ফের ডাকে দুটি কাফ্রি এগিয়ে এল। তারপর বান্টু ভাষায় হাইমেনডর্ফ তাদের যে আদেশটা করলেন, তার ফল হল এই যে, ম্যাহোনি আর ক্রোলের হাত থেকে বন্দুক দুটো তাদের হাতে চলে গেল। প্রতিবাদে লাভ নেই, কারণ অন্য দুজন প্রহরী তাদের তিরধনুক উঁচিয়ে রয়েছে।

এইবার হাইমেনডর্ফ আমার দিকে চেয়ে আবার কথা শুরু করল।

প্রোফেসর শঙ্কু, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।

বলো।

তোমাকে আমার দলে চাই।

এই অসম্ভব প্রস্তাবের জুতসই জবাব চট করে আমার মাথায় এল না। হাইমেনডর্ফ সামান্য বিরতির পর আবার কথা শুরু করল–

গাউসের কাছে শুনেছি তোমার দুটি আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা। একটি পিস্তল ও একটি ওষুধ। টোটা জিনিসটা শুধু যে অনেক খরচ, তা-ই নয়–লক্ষ্য অব্যর্থ না হলে জানোয়ার মারা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিকারি কেউ নেই। অথচ এই সে দিনই এক হাতির পাল এসে আমাদের অনেক ক্ষতি করে গেছে। তোমার পিস্তলে শুনেছি মোটামুটি তাগ করে ঘোড়া টিপলেই কাজ হয়। সে রকম তোমার ওষুধেও শুনেছি ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। অ্যাফ্রিকার ব্যারামগুলো বিদঘুটে। এর লিখের এসেই ম্যালেরিয়া হয়েছিল, আর হাল্‌সমানের হয়েছিল স্লিপিং সিকনেস। জার্মান ওষুধ নেহাত ফেলনা নয়, কিন্তু তোমার ওষুধের মতো আমন অব্যর্থভাবে কার্যকরী নয়। প্রধানত এই দুটি জিনিস চাই বলেই তোমাকে চাই। তা ছাড়া, তোমার পরামর্শেরও দরকার হতে পারে মাঝে মাঝে। ভয় নেই, তুমি আরামেই থাকবে। গুণী লোকের সমাদর আমরা সব সময়ই করি। আর একজনের ক্ষেত্রেও সেটা করেছি।

একটা অদম্য ইচ্ছে হচ্ছিল পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে এই জঘন্য মানুষটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিই, কিন্তু জানি তার পরমুহূর্তেই ওই তিরন্দাজরা আমাদের সকলকে খতম করে দেবে।

বললাম, আমার দল ছেড়ে যাবার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

হাইমেনডর্ফ যেন আমার কথাটা মানল না। সে বলল, তোমার মতো বহুমুখী প্রতিভা আমারও নেই, সেটা আমি স্বীকার করি। টাইপ টু-বিবু ডায়মন্ডের দৌড় কতটা, এর সাহায্যে ইলেকট্রনিক মারণাস্ত্রের কী উন্নতি সম্ভব, সেটা হয়তো তুমি যতটা চট করে বার করতে পারবে, তেমন আর কেউ পারবে না। বলা বাহুল্য, তোমাকে আমরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।

মাপ করো, তোমাকে কোনওরকম ভাবে সাহায্য করার ইচ্ছা আমার নেই।

এই তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টি আমার দিকে চেয়ে থেকে তারপর মুখ খুলল হাইমেনডর্ফ।

ভেরি ওয়েল।

রকেটের হঠাৎ ছটফটানি আর গোঙানির কারণ কী? বাইরে থেকে যে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনছি, সেটা কি বাঁদরের? আসার সময় গাছে কিছু কলোবাস মাঙ্কি দেখেছিলাম।

জেন্টলমেন বলল হাইমেনডর্ফ, এবার তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এসেছে। আমাদের অনেক কাজ। কথা বলে সময় নষ্ট করতে পারব না, বিশেষ করে সে কথায় যখন কাজ হবে না। আমাদের লোক তোমাদের আবার পৌঁছে দিয়ে আসবে যথাস্থানে।

যে যন্ত্রটা ক্রোল দেখছিল, এখন সেটার সামনে গিয়ে হাল্‌সমান দাঁড়িয়েছে।

তা হলে এসো তোমরা, বলল হাইমেনডার্ক। হাল্‌সমান ছাড়া সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। সূর্য পাহাড়ের পিছনে নেমে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে।

গুডবাই, জেন্টলমেন। হাইমেনডর্ফ তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেল।

চারজন কাফ্রি আমাদের দিকে তির উঁচিয়ে রয়েছে। বুঝতে পারছি, আমাদের সময় ঘনিয়ে এল। একটা কিছু করা দরকার। রাস্তাও একটাই।

আমার পিস্তলের সুবিধা হচ্ছে তাকে দেখলে মারণাস্ত্র বলে মনে হয় না। মরিয়া হয়ে পকেট থেকে অ্যানাইহিলিন বার করে তিরন্দাজদের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিলাম। তিনজন তৎক্ষণাৎ উধাও। চতুর্থজনের জন্য পিস্তল ঘুরিয়ে আর একবার ঘোড়া টেপার সময়ে দেখলাম, জ্যামুক্ত তির। আমারই দিকে ধেয়ে আসছে। তিরন্দাজ উধাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিরটা আমার ডান কানের পাশের খানিকটা চুল উপড়ে নিয়ে সশব্দে গুহার কাঠের দরজায় গিয়ে বিঁধল।

রকেট অসম্ভব ছটফট করছে। কলোবাস মাঙ্কিগুলো গাছের উপর চিৎকার করে লাফালাফি করছে।

মাইন গই। চেঁচিয়ে উঠল। ক্রোল—লুক অ্যাট দ্যাট!

পুবে বিশ গজ দূরে গাছের সারির মধ্য দিয়ে আমাদেরই দিকে ধেয়ে আসছে টির‍্যানোসরাস রেক্স! সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার চোখদুটো জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মতো, তার আকর্ণবিস্তৃত হাঁ-এর ভিতর দু পাটি ক্ষুরধার দন্তের সারি যেন চাইছে আমাদের চিবিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলতে।

আমি পকেট থেকে অ্যানাইহিলিনটা বার করে পরমুহূর্তে বুঝতে পারলাম, আমার পিস্তল এই দানবের ক্ষেত্রে কাজ করবে না।

ওটা যে প্রাণী নয়। ওটা রোবট! হাইমেনডর্ফ অ্যান্ড কোম্পানির তৈরি যান্ত্রিক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার!

আর তাকে চালাচ্ছে ওই গুহায় বসে এঞ্জিনিয়ার হাল্‌সমান।

ক্রোলও ব্যাপারটা বুঝেছে, কারণ ও ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে ঢুকেছে। গুহার ভিতর।

যান্ত্রিক দানব দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। অস্ত্রে কোনও কাজ হবে না, তাই কতকটা আত্মরক্ষার জন্যই আমরা আবার গিয়ে ঢুকলাম গুহার ভিতর।

গিয়ে দেখি এক আশ্চর্য নাটকীয় দৃশ্য।

হাল্‌সমানের বাঁ হাত যন্ত্রের কনট্রোলের উপর, ডান হাতে ধরা রিভলভার সোজা ত্যাগ করা ক্রোলের দিকে। ক্রোলের আচরণ কিন্তু ভারী অদ্ভুত। সে মৃদুস্বরে হাল্‌সমানের নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে, আর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে।

হাল্‌সমান! হাল্‌সমান! হাল্‌সমান! রিভলভারটা নামাও হাল্‌সমান! রিভলভারটা নামাও!

আশ্চর্য! হাল্‌সমানের ডান হাত নেমে এল ধীরে ধীরে।

এবার তোমার জানোয়ারের গতি বন্ধ করো হাল্‌সমান, জানোয়ারকে থামাও, আর আসতে দিও না।

হাল্‌সমানের বাঁ হাত আর একটা বোতাদের দিতে এগিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এতক্ষণে আমাদের সকলের কাছেই পরিষ্কার।

ক্রোল হাল্‌সমানকে হিপ্নোটাইজ করেছে। বাইরে জানোয়ারের পদশব্দ থেমে গেল, কিন্তু আমাদের পা হঠাৎ টলায়মান।

মাটি নড়ছে। সমস্ত গুহার জিনিসপত্র থরথর করে কাঁপছে। রকেট প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করছে।

ভূমিকম্প—এবং এর পরে যদি অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়, তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনেক পশুপাখি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পায় তাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। রকেটের চাঞ্চল্যের কারণ এখন বুঝতে পারছি। বানরদের চেঁচামেচিও একই কারণে।

আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম।

দশ হাত দূরে টিরান্যোসরাস অনড়, তার দেহ ভূকম্পে আন্দোলিত হচ্ছে। চতুর্দিকে মানুষের আর্তনাদ শুরু হয়ে গেছে। আমরা দৌড় দেব, এমন সময় একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল।

শঙ্কু! শঙ্কু! দিস ওয়ে–শঙ্কু!

ঘুরে দেখি–তাজ্জব ব্যাপার! ওই দূরে ক্রিস ম্যাকফারসন মরিয়া হয়ে আমাদের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তার পিছনেই একটা হলুদ গোলক আকাশে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে।

রহস্যের সমাধান পরে হবে-এখন প্রথম কাজ হল পলায়ন।

দৌড় দিলাম ম্যাকফারসনের উদ্দেশে।

ডোন্ট লেট দেম কাম।–ম্যাকফারসন আমাদের পিছনে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে।

ঘুরে দেখি, হাইমেনডর্ফ, এরলিখা ও গাউসও ছুটেছে ম্যাকফারসনের দিকে।

চোখের পলকে ম্যাহোনি দুই ঘুষিতে প্রথম দুটিকে ধরাশায়ী করল। গাউস জব্দ হল সন্ডার্সের ঘুষিতে। কাহিন্দি নির্ঘাত কুলির দল সমেত পালিয়েছে; তাদের কথা ভাবার সময় নেই।

এক মিনিটের মধ্যে রকেট সমেত আমরা পাঁচজন ও ম্যাকফারসন প্রোপেন গ্যাসচালিত বেলুনে উড্ডীয়মান। মুকেকু তখন প্রচণ্ড গর্জনে অগ্ন্যুদ্গার শুরু করে দিয়েছে, লাভার স্রোত বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে, আকাশ বাতাস ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, প্রতিটি বিস্ফোরণের ফলে অগণিত প্রস্তরখণ্ড জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ছোট বড় সবরকম বন্য প্রাণী পরিত্রাহি ছুটে পালাচ্ছে প্রকৃতির এই দুযোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

দেখতে দেখতে সব কিছু দূরে সরে গেল। বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে আসছে। যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল, তাকে আবার ক্ষণকালের জন্য দেখা যাচ্ছে, কঙ্গোর আদিম অরণ্যের আদিগন্ত সবুজের এক পাশে এক টুকরো কমলার দীপ্তি জানিয়ে দিচ্ছে সহসা সুপ্তোত্থিত মুকেঙ্কুর অস্তিত্ব।

এতক্ষণে ম্যাকফারসন কথা বলল।

তোমাদের দূর থেকে দেখেছিলাম, কিন্তু কীভাবে যোগাযোগ করব সেটা বুঝতে পারছিলাম না। শেষটায় সুযোগ জুটে গেল দুযোগের মধ্যে দিয়ে।

আমি আমাদের দলের সকলের সঙ্গে ম্যাকফারসনের পরিচয় করিয়ে বললাম, কিন্তু তোমাকে এরা ধরে রাখল কেন?

ম্যাকফারসন বলল, এই যে গ্যাসবেলুনটা দেখছ, এটা তো আমাদের, হাইমেনডর্ফের নয়। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে কাজ করতে হবে বলে এটা আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। দ্রুত পালানোর পক্ষে এর চেয়ে ভাল উপায় নেই। অবশ্যি এ ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।

সেটা কী?

খনিজবিদ্যায় আমি যে ডক্টরেট পেয়েছি, তার বিষয়টা ছিল ব্লুডায়মন্ড। এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি জানা লোক বড় একটা নেই। এ কথাটা জানার পর হাইমেনডর্ক আমাকে রেখে দেয়। না হলে আমাকে আমার দলের আর সকলের মতো। ওই যান্ত্রিক দানবের পায়ের তলায় পিষে মরতে হত। অবিশ্যি এই দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুই হয়তো শ্রেয় ছিল।

ডেভিড প্রশ্ন করল, ওই আশ্চর্য দানব তৈরি করল কে?

পরিকল্পনা হাইমেনডর্ফের। রূপ দিয়েছে গাউস, এরলিখ, হাল্‌সমান আর পঞ্চাশজন বান্টু কারিগর। কারিগরিতে বান্টুদের সমকক্ষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। অনুসন্ধিৎসুদের বিনাশের জন্যই ওই দানবের সৃষ্টি।

আকাশে মেঘ কেটে গেছে। আমরা চলেছি। পুব দিকে। নীচে শহর দেখলেই গ্যাস কমিয়ে নেমে পড়ব।

আর একটা কথা বলতে বাকি আছে ম্যাকফারসনকে।

আমাদের সবই গেছে, তবে সৌভাগ্যক্রমে একটা জিনিস আমার পকেটেই রয়ে গেছে। এই নাও।

কবিগুরুর স্বাক্ষর সমেত ইংরিজি গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ আবার তার মালিকের কাছে ফিরে গেল।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৮
এই গল্পের কিছু তথ্য Michael Chrichton-এর Congo উপন্যাস থেকে নেওয়া।